বিকাশ কান্তি মিদ্যা

[বাইশে জুন, ২০১১ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বাংলা ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক। ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। সৌভাগ্যবশত দক্ষিণচব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর থানা এলাকার গাববেড়িয়া গ্রামে ওঁর বাড়ি। সৌভাগ্যবশত ওই একই অঞ্চলে সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকার জীবন শুরু হয়। সেক্ষেত্রে এ বছরই সেরা লিটিল ম্যাগাজিন পুরস্কার ভূষিত হয়েছে। বাংলা আকাদেমি কর্তৃক। আমরা সুন্দরবনের কথা সাহিত্য বিশেষ সংখ্যা করার জন্য আট জন কথা সাহিত্যিকের মুখোমুখি বসেছিলাম। উপস্থিত ছিলাম বিকাশ কান্তি মিদ্যা মহাশয়ের সঙ্গে সমকালের জিয়নকাঠির পক্ষ থেকে আমি নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল ও প্রদ্যুৎ সরকার।]

সম. জি: আজকের যে প্রথম কথাটা স্যারের কাছে আমরা জানতে চাইব, তা একান্ত পারিবারিক জীবন, শৈশব-কৈশোরের জীবন। উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং ঘটনার পরম্পরার কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত!

বি. কা. মি: আমি তো গ্রামের ছেলে, ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত প্রায় আমি গাববেড়িয়া গ্রামে কাটিয়েছি। আর সেখানকার নদী বলতে তো পিয়ালী। আমার যখন ক্লাস সিক্স তখন পিয়ালিতে বাঁধ দেওয়ার ফলে পিয়ালীর জোয়ার ভাঁটা বন্ধ হয়ে গেল। জোয়ারে সেখানে জল আসত। কাঁকড়ার মেকো পর্যন্ত ভেসে আসত— ওটা বন্ধ হয়ে গেল। ছব্বিশ বছর পর্যন্ত একেবারে ওই মাটিতে ওই পিয়ালী, ওই বাদা। আমরা বাদাই বলি। ওর সঙ্গে একেবারে অন্তরঙ্গ ভাবে আমি জড়িয়ে ছিলাম। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র এক ইঞ্চিও ফাঁক ছিল না। এখনও যখন আমি যাই বাড়িতে, আমার সব সময় আড্ডার জায়গাটা হচ্ছে বাদা। গেলে রাত একটা দুটো বেজে যাচ্ছে বাদাতেই পড়ে আছি। মা বলে আসিস কেন? আসিস তো বাদাতে বসে থাকিস কেন? ফলে বাদাটাই আমার প্রাণ। ফলে সেই বাদা ও সেখানকার মানুষজনকে আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি তো! কাছে থেকে দেখা মানে প্রায় আমাদের নাড়ির মত তো একরমই আর কি! আমার যে রকম তাদেরও সে রকম। হয়ত আমার মধ্যে একটু লেখাপড়া আছে অনেকের মধ্যে সেটা নেই। কিন্তু নাড়ির টানে আমি অনুভব করি। বুঝতে পারি। সেই চোখেই আমি আমার লেখার মধ্যে আনার চেষ্টা করছি। অবিকল্পভাবে অবিকৃত ভাবে। কোন রকম কৃত্তিমতা ছাড়াই।

সম. জি: এটা গেল আপনার ভাবনার কথা। কিন্তু পারিবারিক পরিবৃত্তের কিছু কথা।

নিকটজনের কিছু কথা। আপনার ন'দা, শানোদা, সেজদার কথা। ব্যক্তি জীবনে লেখক হয়ে ওঠার কথা। শৈশবের যাপিত সময়ের বিচিত্র কথা!

বি. কা. মি: এমনি আমরা ছয় ভাই, এক বোন। বোন বলতে আমার দিদি। আমাদের চারটি দাদার পরে একটি দিদি। তারপর আমরা শেষে দুই ভাই। বাবার সেই অর্থে লেখাপড়া প্রায় নেই। বাবা ওই চাষবাস, বাগান চাষ করতেন।

সম. জি: আপনার বাবার নাম?

বি. কা. মি: বাবার নাম সুধীন চন্দ্র মিদ্যা। বাবা মারা গেছেন।

সম. জি: মা?

বি. কা. মি: মা কুমুদিনী মিদ্যা। মা বেঁচে আছেন। এখনো মাকে নিয়ে দু একটা গল্প আছে আমার। বাবাকে তো আমি দেখেছি ধোষার হাটে পণ্য বিক্রি করতেন। হেন জিনিষ নেই যে যা বিক্রি হয়নি আর কি! আমাদের গাছে থেকে আম, জাম, কাঁঠাল, সুপারী, নারকেল, তাল, ঝাঁটার কাঠি। এমন কি ধোঁধোল বলে, যেটা ওই পুরুল আর কি! এর সব কিছু। এর সব কিছু বিক্রি করে আমাদের জীবন চলত। আর সূর্যপুরের হাট ছিল। ধোষার হাট যদি গেটওয়ে অব্ সুন্দরবন হয়, এ তল্লাটের। ধোষার হাট হচ্ছে ধেনো হাট। সূর্যপুরের হাট হচ্ছে ওই তল্লাটের সব চেয়ে বড় চালের হাট। এখন মন্টু ঘরামী মানে মন্টু রায়। মন্টু রায়ের বিশাল চালের গোলা আছে। মন্টু ঘরামীর গোলাতে রাখা চাল বিক্রি করতে যেত। চাল জাত করতে যাওয়া মানে ভান্‌কি কারবার। আমার একটা গল্পতে আছে হ্যাঁ ওই রাক্ষুসে জরুরী অবস্থাটা ছিল সেই সময়ের একটা জ্বলন্ত বিষয় সেটা নিয়ে গল্পটা লেখা।

সম. জি: কৃষ্ণদার কথা!

বি. কা. মি: হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার যে শানোদা'র কথা বলছিলেন কৃষ্ণ কিশোরদা। আমার— নদা। আমার সব দাদা। আমি শুধু একটুখানি পেয়েছি। এমন কি মাটি কেটে, ইস্কুলে ঘন্টা পড়ছে তাড়াতাড়ি করে মাটি কাটা চলছে। মাটি কেটে ইস্কুলে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি করে এসে দেওয়ানের চক্ ইস্কুলে যেতে হত। আমার মেজদা কোলকাতাতে কাজ করতে এসেছিল। বাবুর বাড়ি বলে না! সেখানে কাজ করতে এসেছিল। আমার দিদিমা— আমার বাবা তো ছিলেন, কিন্তু দিদিমাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। দিদিমা মানে বিধবা হয়ে যাওয়ার পরে একটা ছেলে ছিল, ছেলে মারা যাওয়ার পর, ওই একটা ছেলে ও একটা মেয়ে, মায়ের কাছে চলে আসে। দিদিমাই আমাদের বড় করে তোলার পিছনে

বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। আমার ঠাকুরদার নাম বিহারীলাল মিদ্যা। এতদ্অঞ্চলের প্রথম মার্ডার হয়েছিল আমার ঠাকুরদা। সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে। তাদের জন্য মামলা মোকদ্দমা করতে গিয়ে। তাদের হয়ে মামলা মোকদ্দমা কোন স্বার্থ ছিল না। তখন আমার জন্ম হয়েছে। তখন আমার জন্ম মানে তা প্রায় বাহান্ন পঞ্চাশ বছর হবে। পঞ্চাশ বছর আগে আমার ঠাকুরদাকে মার্ডার কার হয়েছিল। এবং সেটাকেও নিয়ে আমি একটা মানে, ওই মৃত্যুর দৃশ্যটাকে নিয়ে আমি রিসেন্ট একটা গল্প লিখেছি। হ্যাঁ গল্পটা ছাপেনি কোনও জায়গায়। তো নাম হচ্ছে জলদর্পণ। জলদর্পণ, আমাদের গ্রামাঞ্চলে আছে যে কোন কিছু চুরি টুরি হয়ে গেলে, জলদর্পণে সব কিছু ধরা পড়ে। আমি তো ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত মাঠে পুরোপুরি কাজ করেছি। জোন খেটেছি। মানে পরের বাড়িতে কাজ করতে যাইনি হয়ত। কিন্তু আমি আমাদের বাড়ির যা অল্প জমি আছে, সেই জমিতে লোকের সঙ্গে কাজ করেছি। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, মানে আমি তখন জানি একঘণ্টা কি আধঘণ্টা রেস্ট, তখন আমি এ বই সে বই পড়ছি। ওই পদার্থ বিজ্ঞান পড়ে, টেস্ট প্রিটেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছি। এইভাবে আমি বড় হয়েছি। দাদাদেরকে আমি ভুলতে পারব না। মানে আমি বড় হওয়ার পিছনে দাদাদের অবদান এমন যে সে কথা ভুলতে পারব না।

সম. জি: আপনার শৈশবের কথা যাপিত সময়ের কঠিক সঙ্কটের কথা শুনলাম। আমরাও সমব্যথি, প্রতিবেশি গ্রামের বাসিন্দা হিসাবে। অনেকটা চেনা জানা সঙ্কটের কথা জানলাম। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। আর যেটা জানতে চাচ্ছি যে, আপনি আপনার পড়াশুনার শুরু থেকে মানে পাঠশালা, প্রাইমারি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে কোন সালে পাশ করেছেন। অনুগ্রহ করে সেসব কথা যদি একটু জানান!

বি. কা. মি: আমি গাববেড়িয়া ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে জীবনের প্রথম পাঠ শুরু করি। তারপর ক্লাস ফাইভে ভর্তি হই ধোষা চন্দনেশ্বর নবীন চাঁদ হাইস্কুলে। ওখান থেকে মাধ্যমিক পাশ করি। একাদশে ভর্তি হলাম দক্ষিণ বারাশত শিবদাস আচার্য উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টআমার খুব ভালো ছিল। কিন্তু আমি যে আর্টস পড়ব, সে কথা কেউ ভাবতে পারেনি।

সম. জি: ওইটাই প্রশ্ন আমার। আমরা যতটা জেনেছি ছাত্র হিসাবে আপনি বরাবরই ভালো ছিলেন। কিন্তু আপনি কলা বিভাগের ছাত্র হলেন কেন?

বি. কা. মি: তার বড় একটা কারণ হচ্ছে আমাদের বাড়িতে অঙ্কে কারও ধাত নেই। আমার শানোদা কৃষ্ণকিশোর মিদ্যা সায়েন্স নিয়ে প্রি-ইউনিভার্সিটিতে কয়েকবার ফেল করে যাওয়ার ফলে ওর লাইফটা অন্য রকম হয়ে গেল। উনি আমাকে বললেন যে- আমার জীবনটা যেভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে তুই তা করবি না! ফলে আমি যখন আর্টস নিয়ে একাদশে ভর্তি হলাম দাদা খুব খুশি হল। আর্টসে আমি যখন ভালো রেজাল্ট করলাম, তখন সবাই বলল আর্টস তোর ভালো হয় আর্টস নিয়ে ভালো করেছিস। তাছাড়া তোদের পারিবারিক নেচারই আর্টসের পক্ষে। তার পর বাংলা অনার্স নিয়ে মৌলানা আজাদ কালেজে ভর্তি হলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম বাংলায় কোনও স্টুডেন্ট নেই। আমরা যে চারজন ভর্তি হয়েছিলাম পুজোর ছুটির পরে গিয়ে দেখলাম তারাও কেউ নেই। আমি একা। মনটা ভীষণ খারাপ লাগত। সবে গ্রাম থেকে শহরে গেছি। গায়ে সদ্য মাটির গন্ধ। উদাস হয়ে তাকিয়ে দেখি একটা চিল উড়তে উড়তে কলেজের সামনের বিদ্যুতের খুঁটিতে বসত। আমি আনমনা হয়ে কখন হারিয়ে যেতাম মেঠো গ্রামের খেত-খামার আর বাদায়। একদম সেখানে মন বসত না। ভীষণ ছটফট করতাম। সেই সময় তিলপি গ্রামের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সা'আদুল ইসলাম মাত্র এক মাসের শিক্ষক ছিলেন আমার।

সম. জি: ওটা কত সালের কথা?

বি. কা. মি: ওটা ছিয়াশি সালের কথা বলছি। উনি আমাকে বললেন তুমি এখানে ভর্তি হলে কেন? তুমি তো ফকিরচাঁদ কলেজে ভর্তি হলে ভালো করতে। আমি বললাম- না, কলকাতায় পড়ার ইচ্ছে ছিল বলে এখানে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু পরে কেউ নেই দেখে আমি বাধ্য হয়ে মৌলানা কলেজ থেকে টি-সি নিলাম। টি-সি নিয়ে আমি ফকিরচাঁদ কলেজে চলে যাই। কিন্তু অনার্সের রেজাল্টটা আমার খুব ভালো হল না। তারপরে আমি ক্যালকাটা থেকে এম. এ. করলাম। বি. এড করলাম। এম. ফিল. করলাম। আমি আর কোন ডিগ্রি বাদ রাখিনি।

সম. জি: এম. ফিলে আপনার বিষয় কি ছিল?

বি. কা. মি: এম ফিলে আমার স্পেশাল পেপার ছিল লোকসংস্কৃতি। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ কিভাবে দেখানো হয়েছে সেই বিষয়।

সম. জি: আপনার পি. এইচ. ডি-র বিষয় কি ছিল?

বি. কা. মি: পি. এইচ. ডি'র বিষয় ছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্থান নাম, সমাজ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে।

সম. জি: আপনার এম. এ বাংলা কোন বিভাগে. লোকসংস্কৃতি বিভাগে কি?

বি. কা. মি: না-না ওটা বাংলা। কিন্তু ব্যাপারটা তো আটশো নম্বরের। ছশো নম্বরের জেনারেলের পরে যে দুশো নম্বর থাকে সেই স্পেশাল পেপারটা লোক সংস্কৃতি।

সম. জি: স্যার, প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা মনে পড়ে গেল। যেহেতু আপনার গ্রাম গাববেড়িয়া, এখনও লোকে কথায় বলে গাববেড়ের বোকা। কেন লোকে গাববেড়ের মানুষদের গাববেড়ের বোকা বলে! অথচ দেখা যাচ্ছে সেই চিরাচরিত গাববেড়ের বোকাদের মধ্যে থেকে আপনি এতবড় একজন মানুষ হয়ে উঠেছেন! রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক হয়েছেন। তাহলে প্রচলিত কথার মূল্য কি? এ বিষয়ে আপনার ধারণা ও মতামত কী?

বি. কা. মি: আসলে ওটা তো একটা মিথের মত হয়ে গেছে। এরকম অনেক উদ্ভট কথাবার্তা আমাদের গ্রাম-সমাজে প্রচলিত আছে। আমাদের গোচরণ দেবলের নাম নিতে নেই নাকি। নাম নিলে হাঁড়ি ফেটে যায়। লোকসংস্কৃতির ছাত্র হিসাবে এ বিষয়গুলোকে একেবারে অবজ্ঞা করি না। কোনো একটা ঘটনা কতকাল আগে কি ব্যাপারে ঘটেছিল তা সমকালের মানুষেরা জানে না। কিন্তু শ্রুতির মত ধারাবাহিকভাবে এই সব মিথ সমাজদেহে প্রবহমান। সেই থেকে গাববেড়ের বোকা কথাটা প্রচারিত হয়েছে। তার মানে এই নয় যে গাববেড়ের সবাই বোকা।

সম. জি: ধন্যবাদ স্যার, আপনার লেখাপড়া শেখার পিছনে পৃষ্ঠপোষক বলুন, সোর্স বলুন নদা, না শানোদা'র কথা বলছিলেন!

বি. কা. মি: শানোদা মানে কৃষ্ণকিশোর বাবু।

সম. জি: তারপরে আপনার গড় গড় করে উত্তরণ। লেখাপড়ার জীবনে আপনার অপ্রতিরোধ্য ডেভলপিং। আপনার যে গ্রাম সেখান থেকে কলঙ্ক মুছে ফেলার চেষ্টা করেছেন, সেখানে আমরা মনে করি আপনি সফল। গাববেড়িয়া গ্রামকে, জয়নগর থানাকে এবং প্রত্যন্ত এলাকার বিশিষ্ট প্রতিনিধি হিসাবে আপনাকে আমরা সমাদর ও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আজকের যে কারণে আমরা আপনার মুখোমুখি হয়েছি, তার প্রতিপাদ্য বিষয় হল সুন্দরবনের কথা সাহিত্য বিষয়ক আজকের আপনার মুখোমুখি বসার প্রথম ও মুখ্য উদ্দেশ্য। কথা সাহিত্যে যে আপনার সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য, মৌলিক ভাবনা ও মৌলিক ভাষা প্রয়োগ যে বিশিষ্টতা পেয়েছে তা পাঠক বা আমরা যারা সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা স্বীকার করি। আমরা সে কথা বুঝতেও পারছি। কিন্তু আপনি লেখক হওয়ার স্বপ্ন

কখন থেকে দেখলেন ? কে আপনাকে অনুপ্রেরণা দিল কোন সময়ে সে কথা যদি একটু বলেন !

বি. কা. মি: আসলে আমাদের দুর্গামূর্তির যে ভাবনা, তাতে দেখা যায় বিভিন্ন দেবতার শক্তি নিয়ে দুর্গা রণরঙ্গিনী হয়ে উঠেছে। তেমন আমরা ছয় ভাই ও দিদিকে নিয়ে সাতজন। আমার বিশ্বাস এই সপ্তশক্তি আমার লেখার প্রাণশক্তি। এখনও আমরা একান্নবর্তী পরিবার। আমরা কেউ আলাদা নই। আমাকে এগিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দাদাদের কৃচ্ছ্রসাধনের একটা নমুনা দিই।— একবার আমার বই কেনার টাকার অভাব হলে আমার বড়দা, ধান পাকা অবস্থায় জমি বন্ধক দিয়ে আমার যাবতীয় সমস্যা মিটিয়েছে। পড়ার বইয়ের বাইরে রবীন্দ্ররচনাবলী, বঙ্কিমরচনাবলী, বিবেকানন্দরচনাবলী ও ইত্যাদি বই আমাকে যুগিয়েছেন।

সম. জি: আপনার বড়দার নাম কি ?

বি. কা. মি: বড়দার নাম সুবল চন্দ্র মিদ্যা।

সম. জি: আপনার বড় দাদা বেঁচে আছেন ?

বি. কা. মি: হ্যাঁ আমার বড়দা সহ সব দাদা বেঁচে আছেন। মেজদা আমাদের বাড়িতে প্রথম চাকরী পেয়েছে, সেজদাও বাংলাতে। মেজদা চাকরীর সুবাদে দূরে থাকতে হলেও, সব সময় নিবিড় সান্নিধ্য ও স্নেহাশিস উপলব্ধি করি। সেজদাও ভালো লিখতে পারত। সেজদার লেখা পড়ে আমি ভিতরে ভিতরে অনুপ্রাণিত হই। আমার ভূমিকাতে আছে আমার সেজদা জীবনানন্দ স্টাইলে কবিতা লিখত। আমার সেজদা এতটাই প্রকৃতি নিবিষ্ট, প্রকৃতিকে দেখার যে আলাদা চোখ আছে তা আমি মর্মে মর্মে বুঝি। আমি যদিও প্রকৃতিকে নিয়ে লেখার চেষ্টা করছি কিন্তু আমি জানি আমার সেজদার প্রকৃতি সত্ত্বার কাছে আমি কিছুই নয়। চাঁদের একটা রেখা হয় আমরা তাকে 'পানমণ্ডপ' বলি। কিন্তু চাঁদের যে রামধনু হয় তা কোন মানুষ দেখেছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আমার সেজদা আমাকে চাঁদের রামধনু দেখিয়েছিল। সেজদা যেমন লেখায় উৎসাহিত করেছে। শানোদা আমাকে সব সময় লেখার জন্য প্রেরণা জুগিয়েছে। শানোদা বলে লেখার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকে। তুই শক্ত হাতে কলম ধর।

সম. জি: লেখা শুরু ইতিকথা বলুন ?

বি. কা. মি: আমার আগের দাদা ওর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাটা নিখুঁত। ওর সঙ্গে আমার ভারি বন্ধু সম্পর্ক। আমার অভিজ্ঞতার অনেক জায়গা ও জুড়ে দেয় আমার ভাবনা

ওর সঙ্গে শেয়ার করতে ভালো লাগে। আমার দিদির কথা বলি, আমি যখন ক্লাস ওয়ান টু-তে পড়ি তখন আমার দিদি বাচ্চাদের পথের পাঁচালি পড়ে আমাকে শোনাত। আসলে আমি লেখাটা জীবনের অনেক দেরীতে শুরু করলেও লেখার ভীতটা তৈরি হয়েছিল শৈশবে দাদা ও দিদিদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে।

সম. জি: ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আপনার অগ্রজ দাদাদের ও দিদিকে। তাঁরা আপনার নৈকট্য ভালোবাসা সুনিবিড় স্নেহ দিয়ে আপনাকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা নিরন্তর চালিয়ে গেছেন। এবার যে কথা বলছিলাম। আপনি তো লেখাপড়া না জানা ঘরের ছেলে। মানে সে অর্থে আপনার বাবা-মা লেখাপড়া জানতেন না। সে বিষয়ে আপনি কি মনে করেন আপনার বাবা, না মা লেখাপড়া শেখার ক্ষেত্রে জেনেটিক্যালি কার প্রভাব আপনাদের মধ্যে পড়েছে?

বি. কা. মি: আমার ঠাকুরদা লেখাপড়া জানতেন। কিন্তু আমার বাবার হয়নি। বাবার মামারা জমিদারী করতেন। বাবা তাদের পিছনে নেচে বেড়িয়েছেন। এক্ষেত্রে আমার মা ও দিদিমার প্রভাব বেশি বলে মনে করি। আমার দিদিমাকে নিয়ে আমার একটা উপন্যাস লেখার বাসনা আছে। লিখতে পারলে অসামান্য একটা উপন্যাস হবে। তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটা অনেক বড় ছিল। তাছাড়া আমি যখন বড় হয়ে উঠছি তখন তো আমার চারপাশে সবাই লেখাপড়া জানা মানুষ। মানে আমার দাদা দিদিরা। ফলে আমার সব সামলেছে দাদারা।

সম. জি: হ্যাঁ স্যার, তাহলে নুন আনতে পান্তা ফুরানো সংসারের ছেলে আপনি। বাবা মার আশীর্বাদ আর দাদাদের সাহায্য সহচর্যে আপনি লেখাপড়া শিখলেন। শিক্ষিত হলেন। আপনার পারিবারিক পরিবেশ যা সেই শৈশব থেকে দেখা। তা আপানার লেখার প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে লেখনিতে আশ্রয় পেয়েছে, সাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে। এখন কথা হল আপনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী পাওয়ার আগে আপনি কি কোন চাকরী পেয়েছিলেন, না এই আপনার প্রথম চাকরী?

বি. কা. মি: আমি অনার্স পাশ করার পর থেকে ইন্টারভিউ দিতাম ও নির্বাচিত হতাম। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাকে চাকরী দিত না। তারা বলত আপনাকে চাকরী দিয়ে কি লাভ। আপনি তো এখানে থাকবেন না। আপনি তো চলে যাবেন। আমি প্রথম ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম হরিনাভী ডি.ভি. এ. এস স্কুলে। কিন্তু ওরা আমাকে চাকরী দিল না- ওই কথা বলে। তারপরে পি.এস.সি দিয়ে

চাকরী পেয়েছিলাম কুচবিহারের জেন্‌কিন্‌স সরকারী স্কুলে। সেখানে দু বছর চাকরী করেছি। এ বছর সেই স্কুলের দেড়শ বছর পূর্তি হবে। খুব বিখ্যাত স্কুল। জেন্‌কিন্‌স স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেও সেই স্কুলটাকে আমি কখনও ভুলতে পারব না। কারণ, ঐতিহ্যবাহী সেই স্কুলে শিক্ষকতা করারও একটা গৌরব আছে। আমি তা উপলব্ধি করি। ওই স্কুলে আব্বাসউদ্দিন ছাত্র ছিলেন। শুধু আব্বাসউদ্দিন নয় ওই স্কুলে অনেক বিখ্যাত মানুষেরা পড়াশোনা করেছেন।

সম. জি: বোঝা গেল জেন্‌কিন্‌স-এর মধুর স্মৃতি আপনাকে ব্যথিত করে। আমরা আপনার ব্যথার সমব্যথি হলাম। আপনার ভাবনা আরো সমৃদ্ধ হোক। আপনার ব্যথাও বহুদিন জারিত হোক, কেন না অতীত স্মৃতি হয় সতত সুখের। এবার আপনাকে আমরা যে প্রশ্নটা করতে চাই, তা হল- আপনি প্রথমে গদ্য না কবিতা দিয়ে আপনার লেখক জীবন শুরু করলেন?

বি. কা. মি: আমার প্রথম জীবনে দু-একটা কবিতা লিখেছিলাম। সেই কবিতা আমার শানোদা মানে কৃষ্ণকিশোরদা সংশোধন করে দিয়েছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কি কবিতা লেখা আমার ঠিক হয়ে উঠত না। আমি যখন অনার্সে পড়ি, তখন ক্লাসে গল্প প্রবন্ধের প্রতিযোগিতা হত। আমি সেসব জায়গায় অংশ নিতাম ও প্রথম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতাম। তারপর দীর্ঘদিন লেখালিখির বিষয় নিয়ে আমি আর ভাবিনি, আবার শুরু এই দু হাজার তিন থেকে।

সম. জি: আপনার প্রথম গল্প প্রকাশ হয় কোন পত্রিকা থেকে?

বি. কা. মি: আমার গল্প খুব সম্ভবত প্রকাশিত হয়েছিল আমাদের এখানে সন্তোষ মণ্ডল 'উত্তালক' বলে একটা পত্রিকা বের করতেন, সেই পত্রিকায় ভৈরবী গল্পটা প্রথম ছাপা হয়েছিল।

সম. জি: আজকের কথা সাহিত্যিক বিকাশ কান্তি মিদ্যা কথা সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন কার সহযোগিতায় ও কোন সময় যদি একটু বলেন।

বি. কা. মি: দু হাজার তিন থেকে তো লেখালেখি শুরু করলাম। দু হাজার ছয়ের দিকে উত্তম পুরকাইতের 'উজাগর' পত্রিকায় 'দানা ব্যাপারীর দিন রাত' নামে গল্পটা লেখার পর অনেক পাঠক আমাকে খুঁজেছেন। তারপরে আমার বইটা বেরিয়ে যেতে আমার পরিচিতি বেড়েছে। তবে 'দানা ব্যাপারীর দিন রাত' পড়ে অনেকে কফি হাউসে আমাকে খুঁজেছেন। বসন্ত লস্কর বলে এক ভদ্রলোক খুব বোদ্ধা পাঠক। ভালো লেখেনও। তিনি গল্পটা পড়ে আমার খুব ফ্যান হয়ে গেছেন।

তারপরে শচীন দা, সাধনদা, অমরদা মানে অমর মিত্র। সৌরভ একটা অনুষ্ঠান করেছিল জীবনানন্দ সভাঘরে। পড়ে পড়লাম আমার গল্পটা নিয়ে স্বপ্নময়দা নলিনিদা সেই সভায় তুলে ধরেছিলেন। তারপর সুভদ্রা পত্রিকায় আমার ঐতিহাসিক ভুল গল্পটা বের হয়। সেই গল্পটাও আমার পরিচিতি এনে দিয়েছিল। ওটা বাংলা আকাদেমিতে কথা সাহিত্য উৎসবে পড়েছিলাম।

সম. জি: আপনি বললেন 'দানা ব্যাপারীর দিন রাত' গল্পের জন্য আপনাকে অনেকে খুঁজেছেন। কিন্তু খোঁজার মূল কারণটা কি বলে আপনি মনে করেন? গল্পের কোন বৈশিষ্টের জন্য তারা আপনাকে আলাদা করে খুঁজছিলেন?

বি. কা. মি: আসলে আমি তো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আমার লেখার মধ্যে তুলে আনছি। ঘটনাটা এরকম। কিছু গাছ আছে যাকে টিকি ধরে টেনে তুলে বসানো হয়। আবার কিছু গাছ আছে গাছের চারদিকের মাটি সমেত তুলে বসাতে হয়। আমি সেরকম আমাদের সমাজের চারধার থেকে প্রকৃতি, জীবন যন্ত্রণা, ভাষা, পালা-পার্বন, উৎসব-অনুষ্ঠানগুলোকে জড়িয়ে নিয়ে লেখার চেষ্টা করছি। আমার দানা ব্যাপারীর দিনরাত নিয়ে যেটা লিখেছি। ঠিক ওভাবে আগে ঠিক লেখা হয়নি বলেই হয়ত। এরকম সাধারণ বিষয় নিয়ে যে অসাধারণ সৃষ্টি করা যায় সেটাও একটা বিষয়। এমন কি কেতকী তুশারী ডাইসন উনি আমার গল্প পড়ে প্রায় পঞ্চাশ মিনিট আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন।

সম. জি: কি নাম বললেন?

বি. কা. মি: কেতকী তুশারী ডাইসন। উনি বিখ্যাত মানুষ, উনি কলকাতার প্রেসিডেন্সিতে রেকর্ড নম্বর পাওয়া। উনি ইংলন্ডে থাকেন। রবার্ট ডাইসনের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার ফলে উনি ইংল্যান্ডে থাকেন। কেতকীদি খুব ভাল লেখেন। উনি আমার গল্প পড়ার পর বললেন বিকাশ তুমি এই রকম জীবনকে ধরেছো। তোমার গল্প পড়ে মনে হয় এসব লেখা আফ্রিকা-টাফ্রিকায় লেখা হয়। আমরা আসলে এইসব ভাবিনি তুমি যা ভেবেছ। আসলে বিষয়ের অভিনবত্ব। গ্রাম নিয়ে লেখালেখি বহু হয়। আসলে আমার লেখায় গ্রাম নিয়ে শুধু তুলে ধরা নয়, তাকে ব্যবহার করা। অন্যভাবে দেখানো। এটাই হয়ত আমার লেখার স্বতন্ত্রতা বা নিজস্বতা।

সম. জি: হ্যাঁ সত্যিই এটা আপনার নিজস্বতা। শচীন দাস, সাধান চট্টোপাধ্যায়রা দ্বিধান্বিত না হয়ে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন আমাদের কাছে। যে বিকাশের শৈলী ঘটনা উপস্থাপন ও নির্মাণ নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। আমরাও দায়বদ্ধতা স্বীকার

করে সুন্দরবনের কথা সাহিত্য সংখ্যায় আপনাকে চেয়েছি। আমরা সম্মানিত বোধ করছি যে আপনার ভাবনা, আপনার লেখা, আমাদের সুন্দরবন চর্চা পিপাসা অনেকখানি মেটাবে। এবার যেটা বলছিলাম স্যার, আপনি তো জানেন যেহেতু আপনি সুন্দরবন অধ্যুষিত এলাকার ছেলে। সুন্দরবন ১০৬৪টা গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে। সেখানে গাববেড়িয়া একটা গ্রাম, ফুলবাগিচা একটা গ্রাম, বাঁটরা অথবা মায়াহাউড়ি, জীবন মণ্ডলের হাট একটা গ্রাম। এই প্রতিটি ছোট ছোট গ্রামের একটা করে ছবি থাকে। কিন্তু সেই গ্রামের ছবিগুলোকে এমন সুনিপুনভাবে প্রয়োগের কৌশল আপনি শিখলেন কিভাবে?

বি. কা. মি: আসলে স্বপ্নময়দার কয়েকটা লেখা পড়ার পরে আমার একটা অনুভূতি হল। কেননা স্বপ্নময়দা শহর থেকে গিয়ে গ্রাম দেখছেন। ফলে গ্রামটাকে ঠিক যেভাবে দেখার সেভাবে হচ্ছে না। আমি গ্রামে থেকে গ্রামকে দেখব। গ্রামের সব মানুষ গ্রাম দেখে। কিন্তু আমার দেখার মধ্যে আলাদা একটা সত্ত্বা কাজ করে। গ্রামের ছবিগুলো আমি অবলীলায় তুলে এনে গল্প লিখব। কিন্তু সেগুলোকে কিছুতেই গেঁয়ো গল্প হতে দেব না। গ্রামের কথা বলব অথচ গল্পগুলো যেন গেঁয়ো গল্প না হয় আমার সেদিকে দৃষ্টি ছিল।

সম. জি: হ্যাঁ স্যার, গ্রামের গল্প উঠে এসেছে আপনার 'ভৈরবী', 'দানা ব্যাপারীর দিনরাত'। আপনার সশ্রম পরিশ্রম এবং অন্তরদৃষ্টির প্রখরতা আমাদের সন্তোষ দান করেছে। 'উত্তরাধিকার', 'বারোমেসে জীবনের কায়দা কানুন', 'রাক্ষুসে কোরঙ্গা', 'জাতশিল্পী', 'ঐতিহাসিক ভুল', 'পরম্পরা' প্রচুর গল্পের মধ্যে গ্রাম্য জীবনের নানা ছবি উঠে এসেছে। আপনার মাতলার সঙ্গে ডিরেক্ট যোগাযোগ। আপনি আগে বলেছেন আপনার বাবা বাড়িতে ফলা নানান পণ্য নিয়ে ধোষার হাটে বেচতে যেত, ধোষার হাট আমাদের সুন্দরবন অভিমুখের দ্বারপ্রান্ত। এই হাট একসময় প্রচুর জমজমাট ছিল। সারা সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপ থেকে মানুষেরা নৌকায় পাল তুলে এই হাটে কেনা-বেচা করতে আসত আমরা সেসব বাচ্চাবেলায় দেখেছি। সেটা আমাদের জীবনের সুখস্মৃতি। এখন যেটা বলার স্যার, আপনার সুদীর্ঘ চর্চার ক্ষেত্রে সুন্দরবনকে কি প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেননি?

বি. কা. মি: প্রশ্রয় দেওয়া বলতে নাজিবুল আমি একটা কথা বিশ্বাস করি। অভিজ্ঞতার তো একটা দাম আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতাকে যদি আমি কাঁচাভাবে বলে যাই তাহলে সে অভিজ্ঞতার কোনো দাম নেই। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাকে যদি শিল্প-

রূপ দেওয়া যায় তাহলে তার মূল্য অনেক বেশি। আমার নিজের জেলা। আমার মাতৃভূমির প্রতি আমার একটা দূর্বলতা আছে। সেটা হয়ত অনেকের থাকে। তবে আমার লেখার মধ্যে ঠিক সুন্দরবন হয়ত উঠে আসেনি। কিন্তু বৃহৎ সুন্দরবন উঠে এসেছে। সুন্দরবনের গ্রামগুলো আমাকে ভীষণ টানে। আমি বহুবার পায়ে হেঁটে ঘুরেছি। একবার তো প্রায় পঁচিশ-তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে ঘুরলাম। বাইরে হয়ত খুব বেশি ঘুরতে যাইনি। তবুও টুকটাক যা গেছি। তাতে আমার মনে হয়েছে আমার বাড়ির পাশে বাদাটা।

সম. জি: সুন্দরবনও আপনার গ্রামের সঙ্গে বর্তমান সম্পর্ক কেমন?

বি. কা. মি: সুন্দরবন আমাকে ভীষণ টানে। বার তিনেক সুন্দরবনের গভীরে গেছি ঘুরতে। যারা অরণ্য আর জলকে আঁকড়ে বেঁচে আছে তাদের কথা শুনতে তাদের সাথে মিশতে ভালো লাগে। আর গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক বলতে আমার তো সব সত্ত্বা গ্রামকে ঘিরে জড়িয়ে থাকে। গ্রামে ফিরলে প্রত্যেকের সাথে মিশি কথা বলি। এমনকি লেখাপড়া না জানা মানুষেরাও আমার খুব বন্ধু। বাচ্চাবেলায় আমরা যারা একসঙ্গে গরু চরাতাম, আজও তাদের সাথে বাদায় বসে আড্ডা মারতে ভীষণ ভালো লাগে।

সম. জি: আপনার বাদাবনের বারোমাস্যা লেখার দুর্নিবার আকর্ষণ আপনাকে পেয়ে বসেছে, সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। এবার আমাদের সে কথাটা জানার ইচ্ছা। প্রত্যেকে লেখকের মধ্যে দুটো ধারা প্রায় দেখা যায়। কেউ অনুসরণ করে, কেউ অনুকরণ করে। আপনি কোন ধারার? কাকেই বা অনুসরণ বা অনুকরণ করেন?

বি. কা. মি: স্বপ্নময়দার লেখা পড়ে একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আমার অন্তরে। অথবা বাচ্চাবেলায় দিদির পড়া পথের পাঁচালি আমার হৃদয়ে রেখাপাত করেছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছা আমি ভিতর থেকেগ্রাম দেখে গ্রামের কথা লিখব। সেখানে ঠিক কাউকে আমি অনুসরণ অথবা অনুকরণ করতে চাইনি। আসলে আমি আমার অনুভূতির কথা লিখতে চাই নিজের মত করে। আগে আমি যাঁর কথা বলেছি সেই বসন্ত নস্করের সঙ্গে এখনও আমার গভীর সম্পর্ক। তিনি আমার লেখা পড়েন নিয়মিত। তিনি বললেন— তোমার লেখার মধ্যে একটা একঘেয়েমি ভাব আসছে। আমি তখন সুন্দরবন থেকে বেরিয়ে একটু আলাদা লেখা লিখতে চেষ্টা করলাম। আমার 'কাক চরিত্র'এর বর্ণনা অতটা প্রকৃতি নিবিষ্ট নয়। একটু অন্য স্বাদের অন্য আঙ্গিকের। লেখার মধ্যে আর একটু বড়

জায়গা ধরে বেরিয়ে আসতে চাইছি।

সম. জি: স্যার, আমরা জানি অনুসরণ ভালো, কিন্তু অনুকরণ ভালো নয়। যে কোন লেখকের বড় হতে গেলে অনুসরণ করতে হয়।

বি. কা. মি: অনেকে অনুকরণ করে। তবে অনুকরণ যদি আত্তিকরণ হয় তাহলে ভালো হয়। কিন্তু হুবহু নকল করার কোনো মানে হয় না। আমি অনুকরণের পক্ষপাতি নই। তবে একটা প্রভাব থাকে লেখার মধ্যে।

সম. জি: স্যার, আমাদের সুন্দরবন কথাসাহিত্যের বিষয়ে কিছুদিন আগে কথাকার ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হয়েছিলাম। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম— শচীন দাস আপনাকে সুন্দরবনের কথাকার হিসাবে ও সুন্দরবনের চিত্র অঙ্কনের রূপকার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেছেন যে কোন লেখকের একটা ছাপ থাকা দরকার। তা আমার লেখায় যদি সুন্দরবনের ছাপ পড়ে পড়ুক না। তা স্যার বলছিলাম, আপনি বসন্ত নস্করকে প্রশ্রয় দেবেন না ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মতকে নেবেন। মানে আপনি যে ঘরানার লেখক সেই ঘরানাকে নিয়ে তো সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা পাওয়া যেতে পারে?

বি. কা. মি: আমি ঠিক এ কথাটা বিশ্বাস করি না। কোথাও একটা জায়গায় বন্দী হয়ে থাকাটা আমার পছন্দ নয়। সুন্দরবনের মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে হয়ত একদিন প্রতিষ্ঠা পাওয়া যেতে পারে, নাম হয়। আমি লেখার ক্ষেত্রে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে চাই। বন্দী হয়ে থাকাটা আমার ভালো লাগে না। লেখাটা তো ভিতর থেকে আসে। সেখানে জোর করে শুধু সুন্দরবনের কথা লিখতে চাইব বললেই তো আর লেখা যায় না। আবার কোলকাতা লিখতে হবেই এটা কোন কথা নয়। লেখা তৈরী হয় ভিতরে সেখান থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এলে ভালো লেখা হয়।

সম. জি: স্যার আপনি বললেন যে আপনার দাদু ওই অঞ্চলে প্রথম রাজনৈতিক ও প্রতিবেশী চক্রান্তে মার্ডার হয়েছিলেন। এই যে নগ্ন অসভ্যতা, প্রতিনিয়ত প্রতি পদে যাদের সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি হতে হয়। এ বিষয়টা আপনার লেখনীর মধ্যে কিভাবে আশ্রয় পেয়েছে?

বি. কা. মি: আসলে সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি ভালো অথবা মন্দ এই মিশ্র ব্যাপারটা সব সমাজে সব জায়গায় থাকে। হিংসা প্রতি হিংসার পাশে মানবতাও বিচরণ করে। আমি বাসন্তীর ওই সাইটে দেখেছি কয়েক মাইল দূরে দূরে খাওয়ার

জলের নলকূপ। খাবার জলের বড় অভাব। অথচ আমি যখন মাইলের পর মাইল হাঁটতে হাঁটতে তৃষ্ণার্ত হয়ে কোন গৃহিনীর কাছে জল চেয়েছি। তারা বহুদূর থেকে বয়ে আনা জল খেতে দিচ্ছে। তখন দেখছি তারা শুধু জলটা খেতে দিচ্ছে না। হয় একটা বাতাসা অথবা একটা নাড়ু যা হোক একটা হাতে দিচ্ছে। এই যে গ্রামীণ মানবতা, মন্দ ঘটনার পাশে এটাও মনে রাখার মত বিষয়।

সম. জি: এ পর্যন্ত আপনার উল্লেখিত গল্প ও গল্প সংকলন যতটা মনে অছে যদি বলেন।

বি. কা. মি: আমার দুটো গল্প সংকলন, একটা হল 'বদল বৃত্তান্ত' আর একটা 'কাকচরিত্র'। আরও গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে কিন্তু সংকলন হয়নি। এরকম কিছু ছোট গল্প নিয়ে আগামী বই মেলায় একটা বই বের হবে। আর কয়েকটা উপন্যাস মাথায় আছে। ধোষার হাট নিয়ে তো একটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছা আছে।

সম. জি: আপনার আগামী দিনের ভাবনা?

বি. কা. মি: গল্প থেকে সরে গিয়ে উপন্যাস লিখব। আমার এক সহকর্মী আমার লেখা পড়ে বলেছিল যে তোমার লেখায় সোহারাব হোসেন বা আকতার উদ্দিন ইলিয়াসের লেখার ছাপ পড়েছে। কিন্তু আমি কখনও আখতার উদ্দিন ইলিয়াসের লেখা পড়িনি। সোহারাবদার সাথে আমার আলাপ পরিচয় আছে কিন্তু তখনও আমি সোহারাবদার লেখা পড়িনি। আমার লেখাগুলো সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব অনুভূতির প্রকাশ।

সম. জি: আমরা বুঝলাম আপনার ট্রেন্ড গল্প থেকে সরে উপন্যাসে যাওয়া, আপনার সমসাময়িক ঔপন্যাসিক— যাঁদের মত, পথ ও ধারাকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা কারা?

বি. কা. মি: আর, আমি প্রথমে বলেছি যে আমি অনুসরণ বা অনুকরণের পক্ষপাতি নই। তবে অনেকের লেখা আমার ভালো লাগে। যেমন সোহারাবদা, স্বপ্নময়দা, সাধনদার লেখা পড়তে ভালো লাগে। শচীনদা আগের থেকে লেখা অনেক কমিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু ভদ্রলোক খুব পড়েন , নতুন লেখকদের উৎসাহিত করেন।

সম. জি: আপনার সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে কারা আপনার খুব বন্ধু বা প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয় আপনার?

বি. কা. মি: না এভাবে কোন উত্তর দেওয়া যায় না বা কারো সম্বন্ধে মন্তব্য করতে খারাপ লাগে।

সম. জি: এই মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কি মতামত?

বি. কা. মি: বাংলা সাহিত্যে এখন প্রচুর লেখক বেড়েছে। প্রচুর লিটিল ম্যাগাজিন বেড়েছে। প্রচুর লেখা হচ্ছে। কিন্তু লেখার মান হাল্কা হয়ে গেছে। আমার লেখার বিচার পাঠকরা করবেন। তবে কথা যেটা হল সেটা ছোট লেখা ও বড় লেখা। কালের বিচারে কোন লেখা বাঁচবে আর কোন লেখা বাঁচবে না। এখন লেখকেরা প্রায় সে কথা ভুলে যাচ্ছে। হাতে হাতে নগদ কিছু পাওনাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। হয়ত সে বিচারে, আমিও ওই আওতায় পড়ে যাব।

সম. জি: স্যার আবার আমরা ফিরে যাবো জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা প্রসঙ্গে। আমরা ইতিপূর্বে সুন্দরবনের উপর তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছি। প্রথম সংখ্যায় সুন্দরবনের জনজীবন। সামাজিক-আর্থসামাজিক, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, লোকক্রীড়া, বিচিত্র পেশা সহ গবেষণাধর্মী নানা নতুন আঙ্গিকে সুন্দরবনকে দেখাতে চেয়েছি। সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি সংখ্যার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। লোকসংস্কৃতির নানা অপ্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে সাজানো, এবারের কথা সাহিত্য সংখ্যায় প্রায় ৪৭ টি গল্প ২২টি উপন্যাসের আলোচনা ও ৮ জন কথা সাহিত্যিকের সাক্ষাৎকার নিয়ে এবারের সংখ্যাটা সাজানোর চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ে মতামত।

বি. কা. মি: আমি সমকালের জিয়নকাঠির সব সংখ্যা সেভাবে পড়িনি। কিছু সংখ্যা পড়েছি। আসলে এখন তো এইভাবেই কাজ হচ্ছে। যতটা পারা যায় মাটিতে নেমে গিয়ে কাজ করা যায়। আমার মনে হয় সমকালের জিয়নকাঠি ঠিক সেই কাজটাই করছে। এই কাজ করার জন্যে আমি নাজিবুল ও প্রদ্যুৎকে ধন্যবাদ জানাব। তবে এখানে আমি যেটা বলতে চাই, তোমরা এবং আমি আমরা সবাই গ্রামের ছেলে গ্রামের প্রতি আমাদের দুর্বলতাটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি যে গ্রামে থেকে গ্রাম দেখব, মানে গ্রামে যা আছে শুধু তাই হুবহু বলা নয়। গ্রামে যে ক্রাইসিস আছে তা শুধু গ্রামের সমস্যা নয়। ফলে অবস্থার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও ব্যাখ্যা করে গ্রামকে উঠিয়ে আনা। অন্য জেলা বা রাজ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সুন্দরবন সংস্কৃতির মানটাকে উচ্চস্তরে উন্নীত করা। এ বিষয়ে তোমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

সম. জি: হ্যাঁ স্যার সমকালের জিয়নকাঠির জন্ম লগ্ন থেকে এ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এবারের সংখ্যাতেও সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে। এর আগে সুন্দরবন নিয়ে বহু

মানুষ নানা ভাবে কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কাজের সঙ্গে আমাদের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। সেটা পাঠকরা নিশ্চয় বুঝছেন। আগামী সংখ্যাগুলোতেও বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে কাজ করব। আপনার পরামর্শের মান্যতা অবশ্যই রাখব। এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে আপনার মূল্যবান সময়ের অনেকটা আমরা কেড়ে নিলাম, এটা শুধু পত্রিকার স্বার্থে। কেননা আজকের কথা সাহিত্যিক বিকাশকান্তি মিদ্যার মুখোমুখি হতে না পারলে একটা বড় ফাঁকি থেকে যেত সমকালের জিয়নকাঠির। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, আপনাকে আমাদের পত্রিকার পক্ষ থেকে।

বি. কা. মি: হ্যাঁ নাজিবুল, তোমরা বার বার বলছ যে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার একটা দরিদ্র চাষী পরিবার থেকে আমি এত বড় হয়েছি, এটা যেমন তোমাদের ভালো লেগেছে; তেমনি আমারও ভালো লাগছে আমার এলাকা থেকে তোমরা এমন এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ শুরু করেছ ও সাহিত্য সংস্কৃতির আঙিনায় এত বড় হয়ে উঠেছ। এতে আমি খুবই গর্বিত ও আনন্দিত।

সম. জি: হ্যাঁ স্যার আমরা চাই আপনার পিছনে পিছনে গ্রাম থেকে এমন অসংখ্যা অধ্যাপক, সাহিত্যিক, গবেষক ও লেখক উঠে আসুক। আমরা আমাদের শ্রম দিয়ে তাদের গবেষণার খোরাক সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারি।

বি. কা. মি: তোমার চেষ্টা ও গবেষণা সার্থক হয়ে উঠুক।

সম. জি: স্যার আপনার 'বদলবৃত্তান্ত' ও 'কাকচরিত্র'-এর মত অসংখ্য কালোজয়ী লেখা আপনার সৃষ্টিকে সার্থক করুক। আপনি বেঁচে থাকবেন আপনার লেখনীর মধ্যে। আপনার সাহিত্য জীবন সমৃদ্ধ হোক। আপনার পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ হোক। আপনি দীর্ঘায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে শ্রীময় করে তুলুন। ধন্যবাদ।

বি. কা. মি: তোমরা এগিয়ে যাও, ভাল থেকো, শুভেচ্ছা রইল।